সন্ত্রাসের দলিল ‘কোরআন’ এর দুটো সুরা

আকাশ মালিক

প্রথম সুরাটির নাম ‘সুরা আল্ আন্ফাল’। অপরটির নাম ‘সুরা তাওবাহ্’। মুহাম্মদ ‘সুরা আল্ আন্ফাল’ প্রকাশ করেণ হিজরী দ্বিতীয় সনে, তাঁর ও কোরায়েশদের মধ্যকার সর্বপ্রথম যুদ্ধে (যুদ্ধে বদর) বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার পর। আর ‘সুরা তাওবাহ্’ বলেছিলেন নবম হিজরীতে, কিছু অংশ ‘হুদাইবিয়া’ সন্ধি প্রাক্কালে, কিছু অংশ ‘তাবুক’ যুদ্ধের প্রস্তুতিকল্পে আর কিছু অংশ ‘তাবুক’ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। উল্লেখিত সুরা দু’টির শা’নে নুজুল বা পটভূমি বিস্তারিতভাবে আলোচনার পূর্বে দেখা যাক সুরা গুলোতে প্রধানত কি বলা হয়েছে।

সুরা আল্ আন্ফাল-

১) তারা তোমাকে যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদ সম্মন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। বলো, ‘যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদ’ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো আর নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ্ ও তার রাসুলকে মান্য করো যদি তোমরা মুমিন হও।

(আর তো প্রশ্ন করা যায় না। ঈমান নষ্ট হওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। ‘নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও’ বিশেষ করে মদীনার সেই সকল নব্য মুসলমানদেরকেই বলা হয়েছে যারা মুহাম্মদকে (দঃ) সত্যি সত্যি আল্লাহ্র রাসুল মনে করে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিল এবং নিজেদের জান-মাল পরিবার পরিজনদের মমতা ত্যাগ করে মুহাম্মদের কথায় যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল, পরে যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদের ভাগ না পেয়ে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেছিল। সুরাটিতে মুহাম্মদ (দঃ) বার বার ‘আল্লাহ্’ শব্দটির সাথে ‘রাসুল’ শব্দ ব্যবহার করেছেন যা’তে মানুষ তার (মুহাম্মদের) আদেশ নির্দেশ যুক্তি-তর্ক বিহীন ভাবে আল্লাহ্রই আদেশ মনে করে এবং অন্ধ ভাবে তা পালন করে।
‘যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদ’ তো আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের’, কথাটি যদি আল্লাহ্র হয়ে থাকে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রথম মানব হজরত আদম (দঃ) থেকে হজরত ঈসা (দঃ) পর্যন্ত কত যুগ কত শতাব্দী অতিবাহিত হলো আল্লাহ্র অথবা আল্লাহ্র কোন নবীর কোন দিন পার্থিব সম্পদের প্রয়োজন হলো না কেন?)

৭) আর স্মরণ করো, আল্লাহ্ তোমাদের সাথে দুটি দলের একটির ব্যাপারে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে, আর তোমরা চেয়েছিলে, যে দলের হাতে অস্ত্র ছিল না তা তোমাদের হউক। কিন্তু আল্লাহ্ চেয়েছিলেন সত্যকে স্বীয় কালামের দ্বারা সত্যে পরিণত করতে আর কাফিরদের শিকড় কেটে দিতে।

(এই আয়াত বা বাক্য পড়ে পৃথিবীর কোন ভাষাবিদ কি বুঝতে সক্ষম হবে যে উল্লেখিত দল দুটি কে বা কারা ছিল কিংবা যাদের হাতে অস্ত্র ছিল না তারা কারা ছিল, তাদের কাছ থেকে মুসলমানরা কি দখল করতে চেয়েছিল? শেষ পর্যন্ত অস্ত্রহীন দলের কি হলো? যে সকল মানুষ মুহাম্মদের (দঃ) সামনে উপস্থিত ছিল অথবা ঘঠনা প্রত্যক্ষ করেছে স্ব-চক্ষে, তারা ব্যতিত পৃথিবীর কোন্ মুসলমান কোরআন পড়ে বুঝতে পারবে এর পেছনের ঘঠনাটা কি? যে কথাগুলো মুহাম্মদ (দঃ) তাঁর

গোটা কয়েক অনুসারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যা অন্য কোন মানুষের বোধগম্য নয়, সেই কথাগুলো সারা জগতের মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র চিরন্তন বাণী বলে মানুষ মেনে নেবে কেন? মুহাম্মদ (দঃ) ভালভাবেই জানতেন কোথায় কি ভাবে আক্রমন করলে কি হবে। আর মদীনায় এসে আল্লাহ্‌, কাফির বা অবিশ্বাসীদেরকে সমুলে উৎখাত বা শিকড় কর্তন করবেন কেন? তারা তো সেচ্ছায় অবিশ্বাসী হয় নি। অবিশ্বাসী হয়ে তারা আল্লাহ্‌রই ইচ্ছা পুরণ করেছে। মক্কায় আল্লাহ্‌ বল্লেন- 'তোমার প্রভু যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে সারা পৃথিবীর মানুষ এক সঙ্গে বিশ্বাস করতো। তুমি কি তবে মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে যতক্ষন পর্যন্ত না তারা মুমিন হয়? আর কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয় বিশ্বাস করা আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিত।- সুরা ইউনুস, আয়াত ৯৯, ১০০)

১২) স্মরণ করো তোমার প্রভু ফেরেস্তাদেরকে প্রেরণা দিলেন- আমি নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে আছি, কাজেই যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে সু-প্রতিষ্ঠিত করো, আমি অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করবো, সুতরাং আঘাত হানো তাদের গর্দানে এবং তাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (হাতের আঙ্গুল) কেটে ফেলো।

(কি সর্বনাশী কথা, আল্লাহ্‌ মানুষকে মানুষ খুন করতে হুকুম দিলেন ! ফেরেস্তারাও খুনের দায়ীত্বে নিয়োজিত হলো। যুদ্ধে ফেরেস্তার স-সস্ত্র বাহিনী মুহাম্মদ (দঃ) ব্যতিত কেউ দেখেছিল বলে তো প্রমান পাওয়া যায় না। ঠিক তেমনি মক্কায় রচিত সুরা 'ফীল' এর বর্ণনানুযায়ী বাদশাহ্‌ আবরাহার ৬০ হাজার সৈন্যের ওপর আকাশ থেকে আবাবিল পাখির পাথর বর্ষন কেউ দেখেছিল বলে সাক্ষ্য প্রমান মিলে না। অবশ্য আবরাহার মক্কা আক্রমনের তারিখ নিয়ে আরবের ইতিহাসে বহু মত-পার্থক্য আছে। ঐতিহাসিকদের মতে আবরাহা মক্কা আক্রমন করেছিলেন মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের কমপক্ষে এক যুগ পুর্বে। মুসলিম ইতিহাসবিদগণ মুহাম্মদের (দঃ) জন্মের সময়টাকে মহামান্বিত করার লক্ষ্যে ইতিহাস বিকৃতি করেছেন। বদর যুদ্ধের পূর্বে কোন কালে কোন নবী পয়গাম্বর স-সস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে কোরআনের কোথাও লিখা নেই। সেই আবাবিল পাখিরা কোথায় গেল? আল্লাহ্‌ নমরুদকে শাস্তি দিলেন মশার দ্বারা, বাদশাহ্‌ ফেরাউনকে মারলেন সাগরের জলে ডুবিয়ে, আরো কত শত জনপদ কত সম্প্রদায় ধ্বংস করলেন নিজ হাতে। হাজার হাজার বছর ধ্বংস লীলায় ব্যস্ত আল্লাহ্‌র হাত কি এতই ক্লান্ত যে মানুষ খুনের দায়ীত্ব এবার মানুষের হাতেই তোলে দিলেন?

১৩) যেহেতু তারা আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের অবাধ্য হয়েছে, আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের বিরোধিতা করেছে তাই তাদের জন্যে এই শাস্তি। আর যে কেউ আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের বিরোধিতা করে- আল্লাহ্‌ তবে শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

('শাস্তিদানে আল্লাহ্‌ অত্যন্ত কঠোর' মক্কায় থাকতে এ কথাটি মুহাম্মদ বহুবার বলেছেন এবং অনেক উপমা উদাহরণও দিয়েছেন । কিন্তু বিগত ১২ বৎসর যাবত বাস্তবে শাস্তি ভোগ করেছেন শুধু মুসলমানরাই স্বদেশে এবং বিদেশে। আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসুলের বিরোধিতা করে মানুষ কামনাও করেছে, ওপর থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের ওপর শাস্তি আসুক। কিন্তু আল্লাহ্‌ অপারগতা দেখালেন। প্লাবন, মশা, আবাবিল, ঝড়, বৃষ্টি, মহামারি সবকিছু পড়ে রইলো মক্কায় রচিত কল্প-কাহিনী হয়ে। মদীনায় এসে শাস্তিদানের হাতিয়ার হিসেবে আল্লাহ্‌ হাতে তোলে নিলেন তীর-বর্শা আর শাণিত তলোয়ার।

১৭) সুতরাং তোমরা তাদেরকে খুন করোনি বরং আল্লাহ্‌ই খুন করেছেন, আর তুমি ছোঁড়ে মারোনি বরং ছোঁড়ে মেরেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্‌ যেন তিনি ঈমানদারগণকে দিতে পারেন উত্তম পুরস্কার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞাতা।

(হায় ! হায় ! সর্বনাশ। এ বিশ্বপতির কথা হতে পারে না। মহান আল্লাহ্ তারই সৃষ্টির সাথে যুদ্ধ করতে সুদুর আকাশের ঠিকানা থেকে নেমে আসলেন বদর প্রান্তে? এক দিকে (কোরআনের মতে, ক্ষিপ্ত বেগে বেরিয়ে আসা না-পাক 'লুতফা' থেকে সৃষ্টি) ছয় শো জন মাটির মানুষ, অপর দিকে আল্লাহরই নুরের তৈরী নবী মুহাম্মদ (দঃ) যার উছিলায় এই বিশ্ব-ভ্রহ্মান্ড, সেই সাথে নুরের তৈরী এক হাজার আর্মি ফেরেস্তা নিয়ে তলোয়ার বর্শা হাতে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা? পায়ের নীচে পড়া পিপীলিকার সাথে বন্য পশু হাতির লড়াই না হয় মেনে নেয়া যায় কিন্ত এ যে সকল সৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহ্। বিশ্ব-প্রভুর কি শোচনীয় অপমান। আল্লাহ্র যদি কাফির মারার ইচ্ছে হতো তিনি বলতেন 'মর' ব্যস ওরা সব মরে সাফ হয়ে যেতো।)

২০) ওহে, যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের আদেশ পালন করো, এবং আদেশ শুনার পর তার থেকে ফিরে যেও না।

(যুদ্ধে মানুষের অনীহা? ওরা ভাবতেই পারেনি মুসলমান হয়ে যুদ্ধ করতে হবে গোত্রের বিরুদ্ধে গোত্রকে, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইকে, বাবার বিরুদ্ধে সন্তানকে।

২৪) ওহে, যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের আদেশ পালন করো যখন তোমাদেরকে সে কাজের প্রতি ডাকা হয় যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। আর জেনে রেখো আল্লাহ্ মানুষ ও তার মনের অন্তরায় হয়ে যান, নিঃসন্দেহে তার কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে।

২৬) স্মরণ করো তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে, দুর্বল অবস্থায় পড়ে রয়েছিলে দেশে, ভীত সন্ত্রস্ত ছিলে যেন লোকেরা তোমাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। তখন তিনি তোমাদেরকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিলেন, স্বীয় সাহায্যে তোমাদিগকে শক্তি দিলেন এবং উত্তম জীবিকা দিলেন যেন তোমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারো।

(কথাগুলো নির্দিষ্টভাবে সেই সকল কোরায়েশদেরকে বলা হচ্ছে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে মুহাম্মদের (দঃ) সাথে ও পরে মদীনায় এসেছিল এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল। মক্কার শরণাথীগন মদীনায় এসে দুই বৎসরের মাথায় উত্তম জীবিকার সন্ধান পেলেন কি ভাবে? কি এমন ধন নিয়ে তারা মদীনায় এলেন? জীবিকার উৎস কি ব্যবসা-বানিজ্য না কি কৃষিকাজ? বাস্তব ইতিহাসে তো এমন কোন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে কি যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদই আল্লাহ্র দেয়া উত্তম রিজেক? ১২ বৎসর যাবত আবিসিনিয়ায় পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের দুর্গতি আল্লাহ্ দেখেন না? সে দেশে আল্লাহ্র উত্তম জীবিকা নেই? আর প্রীয় মানুষদেরকে আল্লাহ্ কেনই বা বিদেশে আশ্রয়ের ঠিকানা দিবেন? বদরের মাঠে ১০০০ আর্মি ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করতে পারলেন, মক্কায় পারলেন না? মাত্র ৫২ বছর পূর্বে আবরাহার ৬০ হাজার সৈন্যকে পাখি দিয়ে পরাজিত করে ৩৬০ দেবতার ঘর মক্কা বাঁচাতে পারলেন আর তার প্রীয় নবী ও বান্দাদেরকে আল্লাহ্ স্ব-দেশে রাখতে পারলেন না?

৩০) আর স্মরণ করো অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে, তারা তোমাকে আটক করবে, অথবা হত্যা করবে অথবা নির্বাসিত করবে। তারা ষড়যন্ত্র করেছিল আর আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করেছিলেন। আর পরিকল্পনাকরীদের মধ্যে আল্লাহ্র পরিকল্পনাই শ্রেষ্ট।

(মানুষের সাথে আল্লাহ্ প্রতিযোগীতা করেন, কে কার চেয়ে ভাল পরিকল্পনা করতে পারে। পলায়নের পরিকল্পনার মধ্যে আবার বাহাদুরির কি আছে?)

৩১) যখন তাদের কাছে আমার বাণী পড়ে শুনানো হয়, তারা বলে- 'আমরা ইতিমধ্যেই শুনেছি, আমরাও এর মতো বলতে পারি। এ তো পুরনো উপকথা বৈ কিছু নয়'।

(দুর্মখদের কেমন স্পর্ধা ! আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলকে চ্যালেঞ্জ করে। এদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া উচিৎ। আল্লাহ্ তো শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।

৩২) আর স্মরণ করো তারা বলেছিল- 'হে আল্লাহ এই যদি তোমার সত্য ধর্ম হয়, যদি কোরআন সত্য হয় তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষন করো অথবা আমাদেরকে কঠিন শাস্তি দাও'।

(এতো সব মর্মন্তুদ শাস্তির কাহিনী শুনেও তারা আল্লাহ্র গজব কামনা করে?

৩৩) আল্লাহ কখনো তাদেরকে শাস্তি দিবেন না যতক্ষন আপনি তাদের মাঝে আছেন, আর তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে।

(কি আজব ব্যাপার ! মক্কায় শাস্তি দেয়া যায় না, মদীনায় দেয়া যায়। সরাসরি স্ব-বিরোধী কথা ! বদরের যুদ্ধে কাফিরদেরকে আল্লাহ্ শাস্তি দিলেন, না আশির্বাদ করলেন? যুদ্ধ চলাকালে মুহাম্মদ তাদের মাঝে ছিলেন, না কি পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেন?

৩৪) আর কি বা তাদের আছে যে আল্লাহ্ তাদের শাস্তি দিবেন না যখন তারা মসজিদে (কা'বা ঘরে) যেতে বাধা দেয়? অথচ তাদের সে অধিকার নেই, তারা এর তত্বাবধায়ক নয়। এর তত্বাবধায়ক হচ্ছে শুধু পরহেজগারগণ, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

(৩
৩ আর ৩৪ নম্বর বাক্য দুটো কি পরস্পর বিরোধী নয়? ৩৬০ দেবতার ঘরের তত্বাবধায়ক হবে মুসলমান, তা'ও মুহাম্মদের জন্মের ৫২ বছর পর?)

৩৫) কা'বা ঘরের নিকটে তাদের নামাজ বলতে শুধু শীষ বাজানো আর হাততালি দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এবার অবিশ্বাসী হওয়ার স্বাধ গ্রহন করো।

(হাততালি দেয়া আর শীষ বাজানোর ধর্মই তো মুহাম্মদের মা আমিনা, বাবা আব্দুল্লাহ্র ধর্ম ছিল। সেই ধর্মানুসারেই তো বিয়ে করলেন মুহাম্মদ এবং নিজের মেয়ে রোকেয়া ও কলসুমের বিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের ধর্মে তারা হাততালি দিলে, শীষ বাজালে মুসলমানের কি আসে যায়? মক্কায় সুরা 'কাফিরুন' এ আল্লাহ্ বল্লেন- 'তোমাদের ধর্ম তোমাদের জন্যে আমার ধর্ম আমার জন্যে'। মদীনায় এসে অন্য ধর্মের সমালোচনা কেন? আল্লাহ্ নিজেই যদি অন্য ধর্মকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন তাহলে মুসলমানদের কি করা উচিৎ?

৪১) আর যদি তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহ্তে ও আমার বাণীতে যা আমি অবতীর্ণ করেছি রাসুলের ওপর ফুরকানের (বদররে যুদ্ধের) দিনে, যেদিন দুই দল মুখোমুখী হয়েছিল, তাহলে জেনে রাখো, যুদ্ধে যা কিছু সম্পদ তোমরা লাভ করো তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ্র তথা রাসুলের ও রাসুলের

নিকটাত্মীয়ের আর এতিম গরীব ও পথচারীদের জন্যে। আর আল্লাহ্ সব কিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান।

(এতক্ষণে পাওয়া গেলো মালের ভাগের হিসেব। মালের ভাগের হিসেবে রাসুলের নিকটাত্মীয়েরা খুশি হলেও মদীনার মানুষ এ নিয়ে প্রশ্ন তোলতেই পারে। মাল পেয়েও কি তাদের যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ বাড়বে? আপন গোত্রের সাথে গলা কাটাকাটি। এই যুদ্ধে কোরায়েশ বংশের হজরত আবু সুফিয়ানের দুই পুত্র অর্থাৎ হজরত মোয়াবিয়ার দুই ভাই খুন হয়েছিলেন। কিছুটা অনুশোচনা কোরায়েশদেরও হতেই পারে।)

৬৫) হে প্রীয় নবী, মুসলমানগণকে যুদ্ধের জন্যে উৎসাহিত করুন। যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি (Diehard) থাকে তবে তারা দু'শো জনকে পরাজিত করবে, আর যদি এক'শো জন থাকে তবে এক হাজার জনকে পরাজিত করবে, কারণ কাফিরেরা জ্ঞানহীন।

(আনুপাতিক হিসেবটা ঠিকই আছে)

৬৬) এখন আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, তিনি জানেন তোমাদের মাঝে দূর্বলতা আছে। কাজেই যদি তোমাদের মধ্যে এক শো জন (Diehard) থাকে তবে তারা দু'শো জনকে পরাজিত করবে, আর যদি এক হাজার জন থাকে তবে তারা আল্লাহ্র হুকুমে দুই হাজার জনকে পরাজিত করবে। আর আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলদের সাথী।

(৬৫ নং আয়াত অনুযায়ী ২০ জন মুসলমান = ২০০ জন কাফির, আর ১০০ জন মুসলমান = ১০০০ জন কাফির, অর্থাৎ ১ জন মুসলমান = ১০ জন কাফির। আর পরের আয়াত অনুযায়ী ১০০ জন মুসলমান = ২০০ জন কাফির, আর ১০০০ জন মুসলমান = ২০০০ জন কাফির, অর্থাৎ ১ জন মুসলমান = ২ জন কাফির। বিষয়টা কী ? শুভঙ্করের ফাঁকি, না অংকে গন্ডগোল? আচ্ছা, অতিরিক্ত শক্তি ও মাল তো পাওয়া গেলো এবার যুদ্ধে বন্দীদের কি করা যায়?)

৬৭) নবীর জন্যে বন্দীদেরকে রাখা সঙ্গত নয় যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘঠেছে, তোমরা চাও ইহকাল আর আল্লাহ্ চান পরকাল। আর আল্লাহ্ পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা।

(আয়াতটির ইংরেজী অনুবাদ নিম্নরূপ- It is not for a Prophet that he should have prisoners of war (and free them with ransom) until he had made a great slaughter (among his enemies) in the land. You desire the good of this world (i.e. the money of ransom for freeing the captives), but Allâh desires (for you) the Hereafter. And Allâh is All-Mighty, All-Wise . (www.quraanshareef.org)
এই মুহূর্তে কোন বিনিময় মুল্যে বন্দীদেরকে ছেড়ে দিলে মুসলমানগণই বিশ্বাস করতেন না যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পদ নয় বরং আল্লাহ্র নির্দেশ।)

৬৮) বিষয়টা যদি আগে থেকেই আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমুদিত না থাকতো তাহলে তোমরা (যুদ্ধে) যে সম্পদ অর্জন করেছিলে তার জন্যে তোমাদের ওপর শাস্তি এসে যেতো।

৬৯) সুতরাং ভোগ করো যুদ্ধে যা অর্জন করেছো পরিচ্ছন্ন হালাল বস্তু হিসেবে। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল মেহেরবান।

(খাও গাও, ফুর্তি করো কোন্‌ গাছের ফল জিজ্ঞেস করো না। যুদ্ধে-লব্ধ সম্পদ গ্রহন করতে মানুষ কি দ্বিধা-গ্রস্থ ছিল?)

৭০) হে নবী, তোমার হাতে যারা বন্দী রয়েছে তাদেরকে বলে দাও যে আল্লাহ্‌ যদি জানতে পারেণ তোমাদের মনে ভাল কিছু চিন্তা আছে তাহলে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে। আর তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল করুণাময়।

(ধর্মের বানিজ্য হচ্ছে? কৌশলে বশ্যতা মেনে নেয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি? জগতের কোন মানুষ কি বলতে পারেন একজন যুদ্ধ-বন্দীর কাছ থেকে যা নেয়া হয়েছে তার চেয়ে উত্তম কি ফেরত দেবার আছে? মা কে সন্তান দেয়া যাবে, সন্তানকে বাবা? মানবতা নিয়ে মুহাম্মদের কি হীন তামাশা !)

৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে প্রতারণা করতে চায়, এর আগে তারা আল্লাহ্‌র সাথে প্রতারণা করেছে সুতরাং আল্লাহ্‌ (তোমাকে) তাদের ওপরে প্রাধান্য দিলেন। আর আল্লাহ্‌ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত ও সু-কৌশলী।

(কথাটি যে মুহাম্মদের তা'তে কোন সন্দেহ নেই কারণ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত ও সু-কৌশলী আল্লাহ্‌ সন্দেহ সুচক শব্দ 'যদি' ব্যবহার করতে পারেণ না। কাফিররা কি করবে, না করবে আল্লাহ্‌ যদি আগে থেকে না জানতেন, তা'হলে বদরের যুদ্ধ সহ যে সকল যুদ্ধ এখনো ঘঠেনি তার বিবরণ হাজার বছর আগে কোরআনে লিখে লাওহে মাহফুজে সযতনে রাখলেন কি ভাবে? কোরআনে আল্লাহ বহুবার বলেছেন যে তিনি কাফিরদের মনে কি আছে তা ভালভাবেই জানেন। এই সুরারই ৬০ নম্মর আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেছেন- 'আর প্রস্তুত রাখবে (মুসলমানগণকে) সবটুকু সামর্থ্য দিয়ে যা কিছু তোমাদের আছে, তেজী যুদ্ধের ঘোড়া দিয়ে, আর তার দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের তথা তোমাদের শত্রুদের এবং অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না, আল্লাহ্‌ তাদেরকে চেনেন। আর যা কিছু তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্থায় (যুদ্ধে) ব্যয় করবে তা তোমরা পরিপূর্ণ ফিরে পাবে আর তোমাদের ওপর অবিচার করা হবে না'।

এখানেও (www.quraanshareef.org থেকে) একটি হাস্যকর ইংরেজী অনুবাদ তোলে দিতে হলো। 'And make ready against them all you can of power, including steeds of war (tanks, planes, missiles, artillery, etc.) to threaten the enemy of Allâh and your enemy, and others besides whom, you may not know but whom Allâh does know. And whatever you shall spend in the Cause of Allâh shall be repaid unto you, and you shall not be treated unjustly'.

'ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না'। এরা কারা? সারা পৃথিবী দুই ভাগ হয়ে গেলো, একদিকে পৃথিবীর সকল মানুষ অন্যদিকে মুসলমান। সেদিন ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল আরববাসী আর আজ আল্লাহ্‌র সৈন্যদের পদভারে সারা বিশ্বই ভীত-সন্ত্রস্ত।

এবার (উর্দু) তাফহিমুল কোরআন (পৃষ্ঠা ৯১৮ - ৯২৭) থেকে সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী কর্তৃক বর্ণীত সুরা আনফালের 'শানে নুজুল' এর সারাংশ।

এই সুরা হিজরী দ্বিতীয় সালে কাফির ও মুসলমানদের মধ্যকার সর্ব প্রথম যুদ্ধ, 'যুদ্ধে-বদর' এর পরে অবতীর্ণ হয়। যেহেতু সুরাটিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর ব্যাপক আলোচনা স্থান পেয়েছে, তাই অনুমান করা যায় যে পুর্ণ সুরাটি একই সময়ে নাজিল হয়েছিল। তবে এটাও সম্ভব যে বেশ কিছু আয়াত যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সমস্যার ওপর নির্দেশাবলী হিসেবে, পরে বিভিন্ন সময়ে নাজিল হয়েছিল এবং পরবর্তিতে ঘঠনার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পুনরায় যথাস্থানে সংযোজন করা হয়েছে। তবে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে সুরাটি বিভিন্ন সময়ে বর্ণীত বিচ্ছিন্ন কিছু বাক্যের সমষ্টি।
সুরাটির ওপর বিস্তারিত আলোচনার পুর্বে বদরের যুদ্ধের কারণগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন। ইসলামের প্রথম দশ/বারো বৎসরে, রাসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) মক্কা থাকাকালিন সময়েই তাঁর নবুওতীর বার্তা স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এর প্রধানত দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, সৎ-চরিত্রের অধিকারী নবীজীর (দঃ) মহানুভবতা ও দুরদর্শীতার সাথে ইসলাম প্রচার করা। নবী (দঃ) তাঁর কার্য-ক্রমের মাধ্যমে প্রমান করে দিয়েছিলেন যে, সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে তিনি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। দ্বিতীয় কারন, মন-মুগ্ধকর ইসলামের প্রতি মানুষের অপ্রতিরোদ্ধ আকর্ষন। সুতরাং কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নবীজীর অগ্রযাত্রা রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হলো না। তাই নবীজীর মক্কী জীবনের শেষ পর্যায়ে আরব নেতাগণ ইসলামকে তাদের ধর্মের প্রতি বিরাট হুমকি মনে করে, তাদের সর্ব শক্তি দিয়ে ইসলামের অগ্র-যাত্রা চিরতরে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর হলো। এদিকে নতুন ধর্ম ইসলাম পূর্ণ বিজয়ের লক্ষ্যে কাফিরদের সকল প্রতিবন্ধকতা জয় করার মতো শক্তি অর্জন করতে তখনো সক্ষম হয় নি। প্রথম কারণ - তখনো প্রমানিত হয় নি যে, তেমন যথেষ্ট মানুষ মুসলমান হয়েছে যারা শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহন করে নি বরং ইসলামের লক্ষ্য ও আদর্শ মনে প্রাণে মেনে নিয়ে, ইসলামের জন্যে তাদের জান-মাল সর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। শুধু তা'ই নয়, এটাও দেখার বিষয় যে নতুন মুসলমানগণ কি প্রস্তুত সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, এমন কি সে যুদ্ধ যদি হয় তাদের আপনজনদের বিরুদ্ধে। যদিও মুসলমানগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কোরায়েশদের অপরিসীম নির্যাতন সহ্য করে প্রমান করেছেন যে ইসলামের প্রতি তাদের দৃঢ় ঈমান ও অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে। তথাপি ইসলাম যে তার এমন একটি অনুসারী দল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে যারা এই পৃথিবীতে ইসলামের চেয়ে অধিক প্রীয় আর কিছু মনে করে না এবং তারা তাদের ধর্মের জন্যে সর্বদা জীবন দিতে প্রস্তুত, তা' প্রমান করার জন্যে এখনো অনেক পরীক্ষা বাকি। দ্বিতীয় কারণ- যদিও ইসলামের বার্তা দেশের সকল যায়গায় পৌছে গিয়েছিল এবং তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র, তথাপি একটি পুরনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন শক্তিশালী সমাজের তীব্র আক্রমনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রয়োজনীয় শক্তি তখনো ইসলামের ছিল না। তৃতীয় কারণ- তখনো ইসলাম তার আলাদা কোন আবাসস্থল বা কেন্দ্রস্থান গড়ে তোলতে পারে নি যেখান থেকে সু-দৃঢ় শক্তি বর্ধন করা যায় ও পরবর্তি করণীয় পদক্ষেপ নেয়া যায়। আর তখন কাফের সমাজের অভ্যন্তরেই ছিল বিচ্ছিন্ন ভাবে দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়া মুসলমানগণের বাসস্থান। যারা তাদেরকে সমূলে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দিতে সর্বদাই ছিল উদ্যোত। চতুর্থ কারণ- মুসলমানগণ তখনো বাস্তবে ইসলামী জীবনের ফল ভোগ করার সুযোগ পান নি। তখন মুসলমানদের জন্যে না ছিল আলাদা কোন ইসলামী রাষ্ট্র, না ইসলামী সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ও সামরিক আইন বিধি ব্যবস্থা।

তাই ইসলামী আদর্শে নিজের জীবন গড়ে তোলার ও পৃথিবী জুড়ে ইসলামী আইন ও আদর্শ বাস্তবায়নের সুযোগ মুসলমানগণ তখনো পান নি।

বারো বৎসর পরে এবার আল্লাহ-পাক মুসলমানদেরকে সেই সুযোগটা করে দিলেন। নবীজীর (দঃ) মক্কায় থাকাকালীন শেষ চার বৎসরে ইসলামের সু-মহান বাণী মদীনায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। নানা কারণে মদীনার মানুষ তুলনামুলক ভাবে অন্যান্য এলাকার মানুষের চেয়ে অধিক হারে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করতে থাকে। ইসলামের দ্বাদশ বর্ষে মদীনা থেকে হজ্জের মৌশুমে ৭৫জন লোকের একটি প্রতিনিধি দল রাতের অন্ধকারে নবী মুহাম্মদের (দঃ) সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহন করেন নি বরং নবী করিম (দঃ) ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণকে মদীনায় আশ্রয় দিবেন বলে ওয়াদাবদ্ধ হলেন। ইসলামের ইতিহাসে এ ছিল মুসলমানদের জন্যে যুগান্তর সৃষ্টিকারী সংগ্রামী আহ্বান যা আল্লাহ্ প্রদত্ত এক পরম নেয়ামত। আল্লাহ্র নবী (দঃ) এমন সুবর্ণ সুযোগটি দু হাত বাড়িয়ে স্বাদরে গ্রহন করে নিলেন। মদীনাবাসী স্পষ্ঠই জানতেন যে তারা একজন পলাতক মানুষকে আশ্রয় দিচ্ছেন না বরং আল্লাহ্র একজন নবীকে (দঃ) আহ্বান করছেন যেন তিনি তাদের নেতা এবং শাসক হন। মক্কার মুসলমানগণকে মদীনাবাসী অপরিচিত একদল নির্যাতিত শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দানের জন্যে আহ্বান করেন নি বরং তারা চেয়েছিলেন মক্কার মুসলমানগণ সহ দেশের অন্যান্য যায়গার সকল মুলমানগণকে একত্রিত করে মদীনায় একটি সঙ্গবদ্ধ মুসলিম সমাজ গড়ে তোলতে। এমনি ভাবে তারা মদীনাকে 'ইসলামী শহর' হিসেবে উপস্থাপন করলেন আর আল্লাহ্র রাসুল (দঃ) তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহন করতঃ একদিন মদীনাতেই আরব দেশের 'প্রথম ইসলামের রাজধানী' প্রতিষ্ঠিত করেন।

মদীনার লোকজন নিশ্চয়ই অবগত ছিলেন যে এই নিমন্ত্রণের পরিণতি কি হতে পারে। স্পষ্টই এই নিমন্ত্রনের অর্থ ছিল সারা আরব বিশ্বের প্রতি যুদ্ধ ঘোষনা করা এবং নিজেদের জন্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক বয়কট ডেকে আনা। 'আকাবা'য় মদীনার আনসারগণ যখন আল্লাহ্র রাসুলের (দঃ) প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন তখন তারা ভালভাবেই জানতেন এর প্রতিক্রীয়া কি হবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে তারা আনুগত্য প্রকাশ করার পূর্বে, মদীনার প্রতিনিধি দলের সর্ব কনিষ্ঠ ব্যক্তি আসাদ ইবনে জুরায়রা জন-সমক্ষে দাঁড়িয়ে ঘোষনা দেন- 'হে মদীনাবাসী, আপনারা খুব সতর্কতার সাথে মনযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন, যদিও আমরা এখানে এসেছি তাঁকে শুধুমাত্র একজন নবী মনে করে, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে তাঁর প্রতি আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে সারা আরব বিশ্বের সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করা। আমরা যখন তাঁকে মদীনায় নিয়ে যাবো তখন আমাদেরকে আক্রমন করা হবে, হত্যা করা হবে আমাদের সন্তান পরিবার পরিজনকে । সকল দিক বিবেচনা করে মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়ার যদি সাহস থাকে তখন, শুধু তখনই আপনারা তাঁর প্রতি আনুগত্য ঘোষন করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে পুরুস্কৃত করবেন। কিন্তু যদি ইসলাম ও নবীর (দঃ) জীবনের চেয়ে নিজেদের সহায় সম্পত্তি, আপনজন, ও স্ত্রী-সন্তানদের মায়া বেশী হয় তাহলে এখনো সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সময় আছে, হয়তো আল্লাহ্ এ জন্যে আমাদের কোন অপরাধ নেবেন না।

চলবে-